তারিখ ..25/7/83...
পৃঃ ...5... কলাম...3...

দৈনিক বাংলা

036

বাংলাদেশে শিক্ষাক্রমের বিস্তার ঃ একটি প্রস্তাবনা

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষার উন্নয়ন সাধনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। শিক্ষাক্রমের উন্নয়নের জন্য সব দেশই কমবেশী তৎপর হয়ে উঠেছে। শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন হচ্ছে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর জন্য পেশাগত দক্ষতা এবং কৌশলের প্রয়োজন। অনেক দেশে কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম রচনা, পরিবর্তন, সংস্কার এবং পরিবর্ধন করা হয়। এই সমস্ত দেশে শিক্ষাক্রমের উন্নয়নের জন্য যদিও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে, তবুও তাদের শিক্ষাক্রমের বিস্তার এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষ গলদ দেখা যাচ্ছে।

শিক্ষাক্রমের বিস্তার এবং ধারাবাহিক অনুসরণের প্রেক্ষিতে বলা যায় বাংলাদেশে শিক্ষাক্রমের সফল হবার সম্ভাবনা খুবই সীমিত। এখানে শিক্ষাক্রমের প্রসার এবং মূল্যায়নের জন্য কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। বস্তুত, ক্লাশের শিক্ষকগণ শিক্ষাক্রম নয় এবং পাঠবই-এর সঙ্গেই বেশী পরিচিত। তাদের একটা বিরাট অংশ শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয় যেমন উদ্দেশ্য, শিক্ষক এবং ছাত্রের জন্য সুপারিশকৃত কার্যাবলী, সুপারিশকৃত শিক্ষা উপকরণ এবং মূল্যায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত নন। এদিক থেকে বলা যায়, শিক্ষকগণ সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্রমের প্রয়োগের চাইতে কেবলমাত্র পাঠবইয়ের ওপরই বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন।

অখতার রওশন পরিচালিত 'শিক্ষাক্রমের তাত্ত্বিক মতবাদ ও বাস্তব প্রয়োগে ব্যবধান' শীর্ষক সম্প্রতিক জরিপে দেখা যায় যে শহর ও গ্রামের নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক যারা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি (সামাজিক বিজ্ঞান) পড়ান তার মধ্যে শতকরা ৬০% জন সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানেন না। শুধুমাত্র শতকরা ২৫ জন শিক্ষক আংশিক ভাবে শিক্ষাক্রম সম্পর্কে অবহিত। এতে বোঝা যায়, প্রকৃত পরিবেশে ছাত্র এবং শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের বাস্তব প্রয়োগ এবং শিক্ষাক্রমের তাত্ত্বিক মতবাদ (শিক্ষাক্রম কমিটির রিপোর্টে আছে) এর মধ্যে একটি বিরাট শূন্যতা রয়েছে।

বিস্তারের প্রক্রিয়ার মত বাংলাদেশে শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন পদ্ধতিও খুবই ত্রুটিপূর্ণ। শিক্ষাক্রমের উপকরণগুলি সারা দেশে প্রয়োগের আগে তার উপযোগিতা যাচাই করা হয় না। এবং শিক্ষাক্রমের উপকরণের বাস্তব প্রয়োগের পরও তার ধারাবাহিক অনুসরণ এবং মূল্যায়নের জন্য কোন সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেয়া হয় না। এই ব্যবস্থা শিক্ষাক্রম রচয়িতাদের প্রয়োজনানুসারে শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন এবং পর্যালোচনার তেমন কোন সুযোগ থাকে না। এটা গতিশীল এবং উন্নয়নমুখী শিক্ষাব্যবস্থার জন্য উপযোগী নয়। একমাত্র বিশেষজ্ঞের স্বরূপ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে শিক্ষাক্রম, বিশেষ করে পাঠ্যবই মূল্যায়নের পদ্ধতি অনেক দেশেই

শামসিয়া সোলায়মান

বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এটাকে কোন মতেই সুষ্ঠু বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া বলা চলে না। এটা শ্রেণী শিক্ষকের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষাক্রমের বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়নে যে সমস্ত কলাকৌশল রয়েছে তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ (ক) জনসংখ্যার বাছাইকৃত লক্ষজনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম পরীক্ষণ (খ) শ্রেণী শিক্ষকের মতামত এবং বিচার বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন।

শিক্ষাক্রম যতই ভালো হোক না কেন, যেসব শিক্ষক তা প্রয়োগের দায়িত্বে আছেন তারা এ সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত না হলে এর কোন মূল্যই নেই। বাংলাদেশ অতীতে বিভিন্ন সময়ে বহু শিক্ষাক্রমের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। সেই সমস্ত শিক্ষাক্রমের ভাল এবং মন্দ উভয় দিকই ছিল কিন্তু সুষ্ঠু প্রসার এবং মূল্যায়নের কলাকৌশলের অভাবে শিক্ষাক্রমের যথাযথ প্রয়োগ হয়নি। যার ফলে জাতি এসব শিক্ষাক্রম হতে উপকৃত হতে পারেনি।

শিক্ষাক্রমের প্রক্রিয়াকে খুবই জটিল এবং স্পর্শকাতর বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এটা কোন না কোনভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাদানরত সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ছাড়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। প্রতিটি শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন, বিকাশ এবং যুগোপযোগী সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যতম উপাদান হচ্ছে গবেষণালব্ধ ফলাফল, শ্রেণী শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, ইন্সপেক্টর এবং পরিদর্শকের পর্যবেক্ষণ। সমস্যার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে, নিম্নে শিক্ষাক্রমের বিস্তার এবং মূল্যায়নের জন্য একটি কৌশলের প্রস্তাবনা করা হলো। এটি চূড়ান্ত কিছু নয়, বরং আলোচনা, পর্যালোচনা এবং সংস্কারের বিষয়।

শিক্ষাক্রম বিস্তারের একটি প্রস্তাবনা ঃ

শিক্ষাক্রম সংস্কারের বিস্তার এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগিতা। শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু এবং শিক্ষকদের ধ্যান-ধারণা অভিজ্ঞতা এবং মতামত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যে এই প্রস্তাবনা নিম্নলিখিত চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করেঃ (ক) শিক্ষক সমিতির পর্যায়ক্রমিক সভা, (খ) চাকরিকালীন এলাকাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, (গ) প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং পত্র বিনিময়, (ঘ) বুলেটিন প্রকাশনা।

প্রস্তাব করা হয় যে ১৫/২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, যাদের সাধারণতঃ একজন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার পরিদর্শন করে থাকেন তারা স্থানীয় শিক্ষক পরিষদের অধীনে সংগঠিত হবেন। স্থানীয় শিক্ষক পরিষদের সদস্যগণ দুমাস অন্তর অন্তর তাদের এলাকার একটি সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থিত স্কুলে কর্মশিবিরে একত্রিত হবেন। সেখানে শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা এবং বিতর্কিত বিষয়ে তাদের ধ্যানধারণা ও অভিজ্ঞতার বিনিময় হবে। থানা শিক্ষা অফিসার তার পদাধিকার বলে এ ধরনের সমস্ত স্থানীয় শিক্ষক পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন, এবং সংশ্লিষ্ট সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার হবেন এ পরিষদের সেক্রেটারী। থানা শিক্ষা অফিসার জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র (এনসিডিসি) এবং স্থানীয় শিক্ষক পরিষদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী সরকারী অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র (এনসিডিসি) শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন, সংস্কার এবং উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি থানা শিক্ষা অফিসারকে সরবরাহ করবেন। তিনি সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের সহযোগিতায় সাময়িক কর্মশিবিরে শিক্ষকদের কাছে তার প্রচার এবং প্রসার ঘটাবেন। অনুরূপভাবে থানা শিক্ষা অফিসার কর্মশিবিরে শিক্ষকদের উদ্ভাবনী চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং তিনি তা জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রে (এনসিডিসি) পাঠাবেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র আবার ভাববিনিময় করবে। একে ধারাবাহিক এলাকাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই একই ধরনের কৌশল মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকও নির্দেশক এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে সেখানে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষকদের পরিষদ সংগঠিত করা সম্ভব।

চাকরিরত অবস্থায় প্রচলিত স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণে কার্যক্রমের পরিবর্তন করা যেতে পারে। নতুন ব্যবস্থার অধীনে, শিক্ষকদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আনার বদলে শিক্ষক প্রশিক্ষকগণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে থানায় যাবেন। ৪৭টি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই)-এর মধ্যে প্রতিটি বিভাগে একটি করে মোট চারটি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর প্রত্যেকটিতে চার দল প্রশিক্ষক থাকবেন। প্রতিটি দল ২৫ থেকে ৩০টি থানায় স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। প্রতি দুই বছর অন্তর প্রতিটি থানায় একবার একটি স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংগঠিত হবে এবং এই ধরনের কোর্সে প্রতি চার বছর অন্তর একবার শিক্ষকদের উপস্থিতি তাদের চাকরির শর্ত

(৭-এর কঃ দ্রঃ)

তারিখ ..25/7/83...
পৃঃ ...5... কলাম...3...

দৈনিক বাংলা

(৬-এর পৃঃ পর)

হিসাবে নির্ধারণ করা হবে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সের বহুবিধ সুবিধা রয়েছে। প্রথমত এটা শিক্ষাক্রমের উদ্ভাবনের বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকদের নতুন চিন্তাধারা এবং প্রতিক্রিয়া ও বাস্তব সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য শিক্ষাক্রমের নবরূপায়ণ এবং উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। তৃতীয়ত, যে পরিবেশে শিক্ষকগণ পড়িয়ে থাকেন এবং যেখানকার উপকরণাদি এবং সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করেন সেই স্কুলে, প্রশিক্ষণ প্রদান অধিকতর বাস্তবসম্মত হবে। কারণ শহরের ভালো পরিবেশে প্রশিক্ষণ লাভের পরে অধিকাংশ শিক্ষক প্রকৃত পরিবেশে তার ব্যবহারে বাধার সম্মুখীন হন। শেষত তিন অথবা চারজনের সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষক প্রশিক্ষকের একটি দলকে থানায় পাঠানো শহরে একদল শিক্ষককে আনার তুলনায় কম ব্যয় সাপেক্ষ। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষক দলের ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরনের স্বল্পকালীন কর্মসূচী মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসা, অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং কারিগরি বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য সংগঠিত করা যেতে পারে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণ শ্রেণী শিক্ষকদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত পরিদর্শন, পত্র বিনিময় এবং প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে মতামত বিনিময় করে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন। শিক্ষকদের শিক্ষাক্রম পরিবর্তন এবং শিক্ষামূলক সংস্কার সম্পর্কে সাম্প্রতিক খবরাখবর জানানোর জন্যে একটি কার্যকর পন্থা হচ্ছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র একটি পাক্ষিক বুলেটিন প্রকাশ করবে যার মধ্যে শিক্ষাক্রমের সংস্কার এবং পরিবর্তন, শিক্ষাক্রম সম্পর্কে দেশে বিদেশে রচিত প্রবন্ধ এবং শিক্ষকদের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধ শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞ এবং অন্যদের দ্বারা সাধারণভাবে শিক্ষা ও বিশেষভাবে শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত প্রবন্ধ সন্নিবেশিত থাকবে। এই বুলেটিনসমূহ নিয়মিত বিনামূল্যে শিক্ষকদের নিকট বিতরণের ব্যবস্থা থাকবে।

এই প্রস্তাবাবলী বাংলাদেশের সম্পদ এবং সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। নামমাত্র প্রারম্ভিক খরচ ছাড়া এসব প্রস্তাবের বাস্তবায়নে কোন বাড়তি খরচ এবং নতুন কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন হবে না। এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হলে বর্তমানে প্রাপ্ত সম্পদ যা সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না তাকে আরও সমন্বিত উপায়ে ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে গতিশীল ও কার্যকর করা সম্ভব।